মুসলিম তরুণদের প্রতি উপদেশ (পর্ব-১)

ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ী

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

□আলউম্মাহ□ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে আমি মুসলিম তরুণদের পুনর্জাগরণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। তাতে আমি পরিশেষে দু□টি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছি।

প্রথম : এই পুনর্জাগরণ একটি স্বাভাবিক ও সুস্থ চেতনার ইঙ্গিতবাহী। এর মাধ্যমে আমরা প্রকৃতি ও মূলের দিকে অর্থাৎ ইসলামের দিকে ফিরে যাচ্ছি। ইসলামই হচ্ছে আমাদের জীবনে প্রথম ও শেষ। এখানেই আমরা বিপদে আশ্রয় নিই, এখানে থেকেই আমরা শক্তি সঞ্চয় করি।

> আমাদের সমাজ পূর্ব ও পশ্চিমের কাছ থেকে ধার করা মতবাদ দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতিসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এখন আমাদের জনগণ ইসলামের অনিবার্য সমাধানের বিশ্বাস করে অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শারীয়াহর বাস্তবায়ন চায়। অতএব এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, মুসলিম তরুণদের সাহস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয় : আমাদের কিছু কিছু তরুণদের মধ্যে যে গোঁড়ামি রয়েছে তা হিংসা ও হুমকি দিয়ে পরিশুদ্ধ করা যাবে না। আল্লাহর দ্বীনের প্রতি এদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় আমাদের কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে তাদের সাথে মেলামেশা করে তাদের মন-মানসিকতা উপলব্ধি করা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে উদ্যোগী হওয়া।

আমি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে মুসলিম তরুণদের এ ব্যাপারে অনেক উপদেশ দিয়েছি। রাসুলুল্লাহ (সা) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈমানদারদের একে অপরের সাথে সর্বদা পরামর্শ করা উচিত এবং ধৈর্যের সাথে সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ ও অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বিরত থাকা। ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনে পুরস্কার লাভের জন্যে এটি আবশ্যকীয় শর্ত। নিচে আমি আরো কিছু উপদেশ দিচ্ছি:

আমরা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের যুগে বাস করছি। জ্ঞানের একটি শাখায় ব্যুৎপত্তির মানে আরেকটি শাখায়ও পারদর্শী হওয়া নয়। যেমন একজন ইঞ্জিনিয়ারের সাথে চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ করা যায় না অথবা একজন চিকিৎসকের সাথে আইনের পরামর্শ চাওয়া হাস্যকর। অতএব শারীয়াহর জ্ঞানও সকলের সমান মনে করা ভুল। এটা ঠিক যে, ধর্মীয় জ্ঞানে শ্রেণী বিশেষের একচেটিয়া অধিকার ইসলাম স্বীকার করে না, যেমন খৃস্টানরদন যাজক গোষ্ঠী রয়েছে বা হিন্দুদের ব্রাহ্মণবর্গ। কিন্তু ইসলামধর্মীয় জ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের অস্তিত্ব স্বীকার করে যারা কোনোভাবেই একটি বিশেষ গোষ্ঠী, শ্রেণী বা উত্তরাধিকারসূত্রে বংশগত নয়। বাস্তব কারণেই ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কুরআন বলেছে: □সকল মুমিনকে এক সাথে অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়, তাদের প্রতিটি দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান অনুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।□ (৯: ১২২)

কুরআন ও সুন্নাহর যেসব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নেই তা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে শিখতে বলেছে: "তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম, তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো।" (২১ : ৭) এবং "যখন শান্তি অথবা শঙ্কার কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে। যদি তারা তা রাসূল অথবা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত।" (৪ : ৮৩)

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "সর্বজ্ঞের ন্যায় তোমাকে কেউই অবহিত করতে পারে না।" (৩৫ : ১৪)

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যখন জানানো হলো যে, একজন আহত ব্যক্তিকে এই ফতোয়া দেয়া হয়েছে যে, অযু ও নামাযের আগে তার গোটা শরীর ধুয়ে ফেলতে হবে, যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছে। তখন তিনি বললেন : "তারা তার মৃত্যু ঘটিয়েছে, আল্লাহ তাদেরও মৃত্যু ঘটান। সঠিক জানা না থাকলে তাদের কি জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল না?"

এটা খুব বেদনাদায়ক যে, কোনো কোনো লোক অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও জটিল বিষয়েও ফতোয়া দিতে অভ্যস্ত যা অতীত বর্তমান আলিমদের ফতোয়ার বিরোধী। তারা আগের আলিমদেরকে অজ্ঞ বলতেও কসুর করে না। তারা দাবী করে ইজতিহাদের দরজা সকলের জন্যে খোলা। এটা সত্য, কিন্তু ইজতিহাদের কতকগুলো শর্ত আছে যা এদের মধ্যে নেই। আমাদের পূর্ববর্তীরা তো অনেক বিজ্ঞ লোককেও সতর্ক বিবেচনা ছাড়া তাড়াতাড়ি ফতোয়া দেয়ার জন্যে সমালোচনা করেছেন। তারা বলেন, "কিছু কিছু লোক এত দ্রুত ফতোয়া দেয় অথচ তা হযরত উমার (রা)-এর কাছে পেশ করা হলে তিনি বদরের যুদ্ধের অংশগ্রহণকারী সকলের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তারা আরো বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে দুঃসাহসী তারা দুঃসাহসী (পাপ করে) দোযখে যাওয়ার ব্যাপারেও।" গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা জটিল বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতেন। যেসব ফতোয়া মৌনভাবে দেয়া হতো ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেগুলোকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেয়া হতো। কারো কাছে ফতোয়া চাওয়া হলে তারা পারত পক্ষে বিরত থাকতেন। আবার কেউ কেউ জানেন না বলে এড়িয়ে যেতেন।

উতবান ইবনে মুসলিম (রা) বলেন যে, একবার তিনি ৩০ মাস উমর (রা)-এর সঙ্গী ছিলেন। সে সময় উমর (রা)কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং তিনি প্রায়শ বলতেন যে, তিনি জানেন না। ইবনে আবুলায়লা (রা) ১২০ জন সাহাবীর, (এঁদের মধ্যে অধিকাংশই আনসার), সম্পর্কে বলেছেন, "তাঁদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি আরেকজনকে দেখিয়ে দিতেন, তিনিও আরেকজনকে দেখিয়ে দিতেন, তিনিও আরেকজনকে, এভাবে পালাক্রমে চলতো যতোক্ষন না প্রশ্নকর্তা আবার প্রথম ব্যক্তির কাছেই ফিরে যেতো।"

আতা ইবনে আস সাবির (র) বলেন যে, তিনি তার সমসাময়িক অনেককে ফতোয়া দিতে গিয়ে কাঁপতে দেখেছেন। তাবিয়ুনদের মধ্যে সাঈদ ইবনে আল মুসাইয়েব (র)কে কদাচিৎ ফতোয়া দিতে দেখা গেছে। অথচ তিনি ফিকাহতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। যদি কখনো দিতেনও তাহলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন তাকে রক্ষা করতে যদি তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে থাকেন এবং তাদেরকেও রক্ষা করতে যারা সেই ফতোয়া অনুসরণ করবে। মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণও অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে তারাও বলতেন যে, জানি না।

> ইমাম মালেক (র) বিশেষভাবে সতর্ক ছিলেন। তিনি বলেন, "কাউকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তার "জান্নাত ও জাহান্নাম" সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত এবং জবাব দেয়ার আগে নিজের পারলৌকিক মুক্তি সম্পর্কে ভাবা উচিত।" ইবনে আল কাসিম (র) ইমাম মালিক (র)কে বলতে শুনেছেন, "আমি একটা বিষয়ে দশ বছর ধরে গবেষণা করছি কিন্তু এখনো মনঃস্থির করতে পারিনি।" ইবনে আবু হাসান (র) বলেন, "মালিককে ২১টি বিষয়ে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল, তিনি মাত্র দু"টির ফতোয়া দিয়েছিলেন। তারপর বার বার বলেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনো সাধ্য বা ক্ষমতা নেই।"

জ্ঞানের অন্বেষা থেকে তরুণদের নিরুৎসাহিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করা আমাদের জন্যে ফরয। আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে তাদের জ্ঞান যতোই হোক, বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে তারা বাধ্য। আশ-শারীয়াহর জ্ঞানে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও উসুল আছে যা জানা ও বোঝার সময় বা উপায় এই তরুণদের নেই। আমি বলতে চাই যারা কলেজে ভালো লেখাপড়া করে তাদেরকে সেটা ছেড়ে দিয়ে আশ-শারীয়ায় বিশেষজ্ঞ হতে হবে এমন প্রবণতা আমি অনুমোদন করি না। জ্ঞানের অন্বেষা ফরযে কিফায়া-এ বিষয়টি অনেকে বুঝতে চায় না। আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে, এখন বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জনের

জোর প্রতিযোগিতা চলছে। কোনো মুসলমান যদি আল্লাহর জন্যে বিজ্ঞানে বুৎপত্তি অর্জনের সাধনায় নিমগ্ন হয় সে আসলেই ইবাদাহ ও জিহাদে অংশ নেয়। এখানে স্মর্তব্য, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ওহী নাযিল হওয়ার কালে তাঁর সাহাবীদের বিভিন্ন পেশা ছিল। তিনি তাদেরকে নিজ নিজ পেশা ত্যাগ করে ইসলাম অধ্যয়নের তাগিদ দেননি; অবশ্য তারা বাদে যাদেরকে এরূপ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কিংবা যাঁদের এ ব্যাপারে স্বাভাবিক ঝোঁকছিল। আমার ভয় হয় অনেকে হয়তো জনপ্রিয়তা বা নেতৃত্ব লাভের খায়েশে শরীয়ার জ্ঞানে দখল চাইতে পারে। মানুষকে প্রলুব্ধ করার জন্যে শয়তানের বহু রাস্তা আছে। অতএব আমাদের চিন্তা, উদ্দেশ্য ও কৌশল সম্পর্কে সতর্ক পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আত্মপ্রতারণার ফাঁদে পড়ে আমরা স্বচ্ছ চিন্তাকে যেন আচ্ছন্ন করে না ফেলি। আমাদেরকে সর্বদা কুরআনের এই আয়াত স্মরণ করা উচিত : "কেউ আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে সে সরল পথে পরিচালিত হবে।" (৩ : ১০১)।

যেহেতু জ্ঞানের প্রতিটি শাখা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচিতি লাভ করে, অতএব তরুণদেরকে সৎ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলিম ও ফকীহদের কাছ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান হাসিলের উপদেশ দিচ্ছি। তাদের দেয়া ব্যাখ্যা ছাড়া সুন্নাহর ধর্মীয় জ্ঞানের প্রধান উৎস-জ্ঞানের সমৃদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। তাদেরকে অশ্রদ্ধা করা মুর্খতা ও ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা আমাদের এই বিজ্ঞ পূর্বপুরুষদের এড়িয়ে নিজেরাই কুরআন-হাদীসে পরাদর্শী হতে চান তাদের ইসলামী শিক্ষার ওপর নির্ভর করা যায় না। একইভাবে যারা উলামা ও ফুকাহার সিদ্ধান্তকে প্রধান অবলম্বন বানায়, কুরআন ও হাদীসকে উপেক্ষা করে, তাদের জ্ঞানের অবস্থাও হৃদয়বিদারক!

আবার অনেক আলিম আছেন যারা সরাসরি কুরআন হাদীসে অধ্যয়ন করেননি, কিন্তু ইসলামের ইতিহাস, দর্শন ও পুঁজিবাদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ । কিন্তু এরা অন্যকে শরিয়াহ শিক্ষা দেয়া অথবা ফতোয়া দেয়ার যোগ্য নন, কারণ তারা তাদের ভাষণে-বিবরণে প্রায়শ সত্যের সাথে পুরান, বিশুদ্ধকে শুদ্ধ, সারকে অসারের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। তারা এমন ভুল ফতোয়া দিয়ে বসেন যা হয়তো তারা নিজেরাও বোঝেন না।

এছাড়া যার আমল নেই তার শিক্ষা বা নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার নেই। সততা, সাধুতা ও আল্লাহ ভীতি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের ফল। কুরআনুল কারীম বলছে, "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাকে ভয় করে।" (৩৫ : ২৮)

এরূপ সাধুতা ও আল্লাহ ভয় একজন আলিমকে মুর্খতাসুলভ কাজ এবং শাসক অথবা সরকারের সেবা দাস হওয়া থেকে বিরত রাখে।

বিজ্ঞানের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভারসাম্য। এটা ইসলামরেই অনুপম বৈশিষ্ট্য। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দু"টি প্রান্তিক প্রবণতা আমাদের রয়েছে: চরমপন্থা, শিরক, অবহেলা, গোঁড়ামি কিংবা বিচ্ছিন্নতা। আল-হাসান আল-বসরী (র) সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, "চরমপন্থী উদাসীনদের কার্যকলাপের দরুণ ধর্ম হারিয়ে যাবে।" প্রথমোক্ত দল সবকিছু নিষিদ্ধ করবে আর শেষোক্ত দল সবকিছু বৈধ করবে। প্রথম পক্ষ মাযহাব মানবে কিন্তু ইজতিহাদের দরজা রুদ্ধ করে দেবে। দ্বিতীয় পক্ষ মাযহাব অস্বীকার করে তার সকল নীতি খন্ডনে প্রয়াসী হবে। এছাড়া আরেক দল কুরআন-হাদীসের আক্ষরিক অর্থ মেনে চলতে চায়। যা হোক দুই চরমের মাঝে আসল ইসলাম হারিয়ে যায়। অতএব আমাদের দরকার ভারসাম্যময় সাধু ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ফকীহ যারা সুচিন্তিতভাবে যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রায় দেবেন যা সাধারণ মানুষের জন্যে কল্যাণকর হবে। ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী বলেন, "সুস্পষ্ট যুক্তির ভিত্তিতে কোনো কিছুকে বৈধ করা জ্ঞানের পরিচায়ক, আর গোঁড়ামি তো যে কেউ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।"

উৎসঃ ইসলামী পুনর্জাগরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা - ড. ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ী

দ্বিতীয় পর্বঃ মুসলিম তরুণদের প্রতি উপদেশ

ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ী

প্রফেসর ড. ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ী একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, পন্ডিত ও কুশলী। ইসলামী জ্ঞানে তাঁর গভীরতা এবং সমসাময়িক বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের কি ভূমিকা হবে সে বিষয়ে সুচিন্তিত মতামতের জন্য তিনি সারা বিশ্বে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র। ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংলাপের উপর তিনি সব সময় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিখ্যাত মিশরীয় পণ্ডিত ড. ক্বারাদাওয়ীর জন্ম ১৯২৬ সালে। দশ বছর বয়সেই তিনি সম্পূর্ণ কুরআন হেফজ করেন এবং কুরআন তেলাওয়াতের নীতিমালা, তাজবীদের উপর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তিনি আল আজহারেই পড়ালেখা করেন। ১৯৭৩ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উসূল আল দ্বীন অনুষদ হতে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ড. ক্বারাদাওয়ী আল আজহার ইনস্টিটিউটে মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশুনার সময়ই তার প্রতিভার স্বাক্ষর হিসেবে শিক্ষকদের কাছ থেকে আল্লামা বা মহান পণ্ডিত খেতাবে ভূষিত হন। ১৯৫৮ সালে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর ডিপ্লোমা করেন। এর আগে তিনি আরবী ভাষা অনুষদ থেকে শিক্ষকতার সনদ পান।

ড. ক্বারাদাওয়ী মিশর সরকারের আওকাফ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বোর্ড অব রিলিজিয়াস এফেয়ার্স-এর একজন সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি আলজেরীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ইসলামিক সায়েন্টিফিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমানে তিনি জেদ্দাস্থ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) ফিকাহ একাডেমী, মক্কাভিত্তিক রাবেতা আল আলম আল ইসলামীর ফিকাহ একাডেমী, রয়াল একাডেমী ফর ইসলামিক কালচার এন্ড রিসার্চ জর্ডান, ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার অক্সফোর্ড-এর সদস্য, ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্চ-এর প্রেসিডেন্ট এবং কাতার সীরাহ স্টাডিজ সেন্টারের পরিচালক। তিনি বাংলাদেশস্থ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম এর ট্রাস্টি বোর্ডেরও সদস্য।

তাঁর এ পর্যন্ত ৪২টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি, তুর্কী, ফার্সী, উর্দু, ইন্দোনেশিয়া সহ বিশ্বের অন্যান্য অনেক ভাষায় তার বই অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত এ বইটি সহ মোট ৮টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ‘ইসলামে হালাল-হারামের বিধান’, ‘ইসলামের যাকাত বিধান’, ‘ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন’ বই তিনটি খায়রুন প্রকাশনী প্রকাশ করেছে। এছাড়া নতুন সফর প্রকাশনী, ঢাকা ‘আধুনিক যুগ, ইসলাম, কৌশল ও কর্মসূচি’ এবং সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কুরআন এন্ড সুন্নাহ, চট্টগ্রাম ‘দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম’ প্রকাশ করেছে। ড. ক্বারাদাওয়ীর ইংরেজি ভাষায় অনূদিত www.qardawi.net/english বই ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়।

তিনি একজন স্বনামধন্য কবি। নিজস্ব কাব্য বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি আরব বিশ্বে সুপরিচিত। বর্তমানে ড. ক্বারাদাওয়ী আল জাজিরাহ টেলিভিশনে একটি সরাসরি সম্প্রচারিত সাপ্তাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করছেন। বিশ্বের কোটি কোটি দর্শক শ্রোতা এ অনুষ্ঠান উপভোগ করে থাকেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি ইসলামের একজন সক্রিয় কর্মী। এর জন্য তাঁকে ১৯৪৯, ১৯৫৪-১৯৫৬ এবং ১৯৬৫ সালে কারাবরণ করতে হয়। আরব ও মুসলিম দেশ সমূহের প্রতি পাশ্চাত্য বিশ্বের বিশেষ করে আমেরিকা ও বৃটেনের পররাষ্ট্র নীতির জন্য তিনি তাদের একজন কঠোর সমালোচক। একই সাথে ফিলিস্তিন প্রশ্নে ইসরাঈলের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ, একপেশে ও নিঃশর্ত সমর্থনের তিনি তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করেন। ইরাকে ইঙ্গো-মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে তার সাম্প্রতিক বক্তব্য বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগণের মতামতকে শাণিত করতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। তিনি একজন মানবাধিকারের প্রবক্তা। নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের সপক্ষে তিনি সোচ্চার যা তার বিভিন্ন লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছে।

ড. ক্বারাদাওয়ী পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, আরব ও মুসলিম দেশসমূহ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছেন। তিনি বাংলাদেশেও বেশ কয়েকবার এসেছেন।